একক: ৩.০১.৬ ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০ - ১৮৭০)

মাত্র তিরিশ বছরের জীবনে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় কৃতিত্ব রেখে গেছেন। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দেবীর প্রসন্ন মিলন দেখা যায় তাঁর মধ্যে। 'মেঘনাদ বধ কাব্য' রচয়িতাকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদোৎসাহিনী সভা তার রঙ্গমঞ্চে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, বহুবিবাহনিবারণ আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন আরও বহু সমাজিক দায় তিনি পালন করেছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য - 'বাবুনাটক' (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্ব্বশী নাটক' (১৮৫৭), 'সাবিত্রীসত্যবান নাটক' (১৮৫৮), 'মালতীমাধব' (১৮৫৯), 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (প্রথম ভাগ ১৮৬২, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১৮৬৪) এবং 'পুরাণ সংগ্রহ' (১৮৬০ - ৬৬)। এ ছাড়া তিনি কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন - 'বিদোৎসাহিনী পত্রিকা' (মাসিক, ১৮৫৫), 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' (মাসিক, ১৮৫৬) প্রভৃতি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ স্মরণীয় হয়ে আছেন 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' এবং মহাভারতের বঙ্গানুবাদের জন্য। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' তাঁকে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি এনে দিয়েছিল। এবার আমরা তাঁর গদ্যরীতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যরীতি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিমত প্রকাশ করছেন তা জানা প্রয়োজন- "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর, এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতা শূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।" ('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ব.)

হুতোমি ভাষার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিযোগ করেছেন তার সবটা মেনে নেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে নিম্নের অভিমতটি গ্রহণ করা যেতে পারে —

" এ ভাষা (হুতোমি ভাষা) কিছু অশালীন হতে পারে কিন্তু কী প্রাণশক্তি। নাগরিক লোকের তুলনায় গ্রাম্য লোক অশালীন হতে পারে; গ্রাম্য লোকের বেশভূষা, আচার ব্যবহার ও ভাব ভাষা কিছু অশালীন হতে পারে কিন্তু নিছক প্রাণশক্তিতে সে কারো কম নয়। হুতোমের ভাষা, কিম্বা আরো বিশেষ করে বলতে গেলে বলা উচিত, লোকমুখের যে ভাষাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্ত্তী সাহিত্যে তা বিচিত্র ফল প্রসব করেছে। এই ভাষা রীতির উত্তরপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষা আর খুব সম্ভব ব্রহ্মবান্ধবের সাংবাদিকতার ভাষা।" ('বাঙ্গলা গদ্যের পদাঙ্ক', ভূমিকা, পৃ. ৮৫)

কলকাতার মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, সেই নিত্যব্যবহার্য ভাষায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' রচনা করে কালীপ্রসন্ন বিপ্লবাত্মক কাজ করেছিলেন। আলালের ফারসি বহুল ভাষা প্রশংসা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন, কিন্তু প্রাণশক্তির অভাবে সে ভাষা সে যুগেই অপ্রচলিত হয়ে যায় এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করেও তা গ্রহণ করেননি — আর

হুতোমি ভাষা যেহেতু লোক মুখের ভাষা, তা সব সময় শালীন হয়ে ওঠেনি, কিন্তু - এই ভাষাকে নিয়ে পরবর্তী পর্বে বাংলা চলিত গদ্যরীতির আন্দোলন হয়েছিল প্রবল এবং এর ব্যবহার বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলালি ভাষা বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আর হুতোমি ভাষা নূতন রীতির গোড়াপত্তন করেছিল। কলকাতা অঞ্চলের উপভাষা পরবর্তী পর্বে মান্য চলিত গদ্যরীতি হয়ে উঠেছে - হুতোমি ভাষা সেই উপভাষায় রচিত বলেই তার প্রাণশক্তি আজও ফসল ফলিয়ে চলেছে। এ রীতির প্রধান গুণ এর সরসতা। সর্বত্র মার্জিত না হলেও এ সরসতা কৃত্রিম নয়। একটু নমুনা নেওয়া যেতে পারে —

"অমাবস্যার রাত্তির - অন্ধকার ঘুরঘুট্টি - গুড়গুড় ক'রে মেঘ ডাকচে - থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাচ্চে— গাছের পাতাটি নড়চে না - মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে - পথিকেরা একবার আকাশ পানে চাচ্চেন - আর হন হন করে চলচেন। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করচে - দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে; - গুড়ুম ক'রে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।"

— হুতোম প্যাঁচার এ ভাষার অসম্ভব গতি; ড্যাশ চিহ্নের মাধ্যমে গতির রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'রাত্তির', 'ঘুরঘুট্টি', ডাকচে', 'নলপাচ্চে', 'পাতাটি', 'পড়চে', 'চাচ্চেন', 'চলচেন', 'উজ্জুগ কচ্চে' - প্রভৃতি লোকমুখের ভাষার উচ্চারণ সমেত রূপটি আলোচ্য গদ্যাংশে ফুটে উঠেছে - এখানেই হুতোমি ভাবার দোষ এবং গুণ। তবে দোষের দিকটি গুণের গুণে ঢাকা পড়ে গেছে।

সংস্কৃত পণ্ডিতদের সহযোগিতায় মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ সাধু রীতিতে কালীপ্রসন্ন রচনা করেছিলেন। গুরুচণ্ডালি দোষ নেই বললেই চলে। এ গ্রন্থের ভূমিকা থেকে গদ্যরীতির নমুনা নেওয়া যেতে পারে —

"যাহাতে এদেশীয় লোকে অতীব আদরণীয় ভারত গ্রন্থের সমস্ত মর্ম্ম প্রকৃতরূপে অবগত হইয়া সুখী হইতে পারেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষের গৌরব স্বরূপ মহাভারতের অবশ্যম্ভব মর্য্যাদা চিরদিন বর্ত্তমান থাকে তাহার উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই দুঃসাধ্য ও চিরসঙ্কল্পিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।" (মহাভারত', অনুবাদ ভূমিকা, ১৮৬০)

— বিশুদ্ধ সাধু গদ্য রচনায় তিনি যে পারদর্শী ছিলেন তা আলোচ্য গ্রন্থের গদ্যরীতি পড়লেই বোঝা যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্য - সৃষ্টির মধ্যে কলকাতা অঞ্চলের উপভাষায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' অনায়াস ভঙ্গিতে লিখেছেন আবার সাধু গদ্যে মহাভারতের অনুবাদ করেছেন স্বচ্ছন্দ গতিতে। কথ্যরীতি এবং সাধুরীতি উভয়ের চালটি খুব ভালোভাবে বুঝতেন বলেই কোনো মিশ্রণ ঘটেনি তাঁর গদ্যে। বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাসে তাই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।